THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue (2019) (ISSN: 2278-2699)

চর্যার বিনির্মাণ : প্রসঙ্গ সাইমন জাকারিয়ার বোধিদ্রুম

সনৎ পান*

বাংলাদেশের কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, লোকসংস্কৃতি গবেষক সাইমন জাকারিয়া বাংলা নাট্য ধারায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। জন্ম ৩রা জুন, ১৯৭২, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। ওপার বাংলার লোকসংস্কৃতি গবেষক ও নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া 'বাংলা আকাডেমীর' ফোকলোর উপবিভাগের সহ পরিচালক। লোকসংস্কৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণ তাঁর সাহিত্যকে সৌরভে মোহিত করেছে। তাঁর নাটক আধুনিক ও ঐতিহ্যের অনুবর্তনের সার্থক ফসল। প্রথম নাটক *শুরু করি ভূমির গায়ে* বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পৌরানিক উপস্থাপনা। দীর্ঘকালের ইতিহাস চেতনার ফসল চর্যাপদের প্রথম নাট্যখ্যান *বোধিদ্রুম*। ১৯৯৮ সালে *সহজিয়া* পত্রিকায় নাটকটি *ন নৈরামনি* নামে প্রকাশিত হয়। *ন নৈরামনির* নবভাষ্য *'বোধিদ্রুম'* নাটকটি। এই নাটকটি চর্যাপদ অবলম্বনে বর্ণনাত্মক নাটক। প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ অনুসন্ধান ও অনুধাবনের সার্থক ফসল *বোধিদ্রুম*। সমালোচক অরুন ঘোষের ভাষায়-

> 'বোধিদ্রুম'কে বুদ্ধ নাটক বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এ নাটকে শুধু বুদ্ধের জীবন কাহিনীই নয়, বাংলার লোকসমাজের সাধারণ নরনারীর সাধারণ জীবন কাহিনীও বিধৃত। তাই সাইমনের বুদ্ধ নাটক বোধিদ্রুমে শবর শবরীর জীবন উঠে এসেছে চর্যাপদের উপর ভর করে।[১]

নাট্য কাহিনির সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধের মন্ত্র, বুদ্ধের অনুষঙ্গ। প্রাচীনকালে বাঙালীর সুখ-দুঃখে ভরা প্রাত্যহিক প্রেম দাম্পত্যের নানা ধরণ, বিবাহের বিবরণ, দস্যু আক্রমনের ভয়াবহতার পাশাপাশি জীবনযাপনের বিড়ম্বনা নাট্য অবয়বে চিত্রিত হয়েছে।

নাট্যকার চর্যাপদ থেকে টুকরো টুকরো কাহিনি সংগ্রহ করে নাটকের কাহিনিবৃত্ত অঙ্কন করেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন চর্যার পদের অভ্যন্তরে ফল্গুধারায় প্রবাহিত আখ্যানের নাট্যরূপ *বোধিদ্রুম*। চর্যার বানী, সুরের আধুনিক রূপায়ণে প্রেম, বিবাহ, দাম্পত্য ও নানা সামাজিক সংকটের সার্থক রূপায়ন ঘটেছে এ নাটকে। *বোধিদ্রুম* নাটকে প্রাচীন বাংলার সুখ-দুঃখময় জীবন কথা অন্বেষনই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

*স্যাক্ট, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ
sanatpan@gmail.com

নাট্য অবয়বে উঠে এসেছে বুদ্ধ নাটকের নানা প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ। তৎকালীন সমাজ ও জাতীয় জীবনে নাটকের প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।[২]

বুদ্ধ নাটকের আসরে বঙ্গালের বজ্রাচার্য প্রভুর কাছে বোধিচিত্ত লাভ করে মরজীবনের দুঃখ কষ্টের সীমাকে অতিক্রম করা যায়। চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে দমন না করলে বোধিচিত্ত লাভ সম্ভব নয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত রাত্রে নতুন বোধিচিত্ত প্রার্থী তরুণ কাহ্নু। বজ্রাচার্য কাহ্নুকে বোধিচিত্ত দেয় না। কেননা, কাহ্নুর চেতনার গভীরে নিহিত ইন্দ্রিয় পিপাসা। প্রভুর নির্দেশে বিবাহের মাধ্যমে মরজীবনের ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তির দ্বারা বোধিচিত্ত লাভ সম্ভব। বজ্রাচার্যের কথার সুর অনুরনিত হতে থাকে কাহ্নুর মনে। কাহ্নুর মা চায় পুত্রের বিবাহ দিয়ে মোহিনী কন্যার মোহে কাহ্নুকে বেঁধে রাখতে। ইন্দ্রিয় সুখের মধ্য দিয়ে বোধিচিত্তে পৌঁছানোর যে নির্দেশ সহজিয়া গুরু বজ্রাচার্য দিয়েছেন তা নাটকে বর্ণিত। বিবাহ উৎসব ও আচার, বিবাহ পরবর্তী প্রণয় ও আসক্তি, কাহ্নুকে গৃহে বেঁধে রাখার জন্য মায়ের চেষ্টা, ডোম্বীর চেষ্টা। বিবাহের পথে পাহাড় দেখে ডোম্বীর কেঁপে কেঁপে পাহাড়ের মতো একাকিত্ব অনুভব করে। বিবাহোত্তর আচারের দ্বারা কাহ্নুকে বেঁধে রাখতে চায় সকলে। তাতে বিবাহ পরবর্তী প্রেমের প্রগাঢ়তা প্রকাশিত-

ডোম্বীর সঙ্গে যো কাহ্নু রত্ত
খনহ না ছাড়ই সহজ উন্মত্ত।[৩]

কাহিনিসূত্রে মোহনীয় পৃথিবীর মায়ায় মিশে যায় কাহ্নুও ডোম্বী। এ পথে আসে তাদের জীবনে আগামীর শুভ সংবাদ।

নাট্যকার নিপুন দক্ষতায় চর্যাপদের কাহিনির বিনির্মাণ করেছেন আখ্যানের অন্তরালে। বুদ্ধ নাটকের প্রসঙ্গ অনুষঙ্গে বজ্রাচার্য প্রভুর বোধিনৃত্যের সংবাদে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয় বঙ্গালে। নাটকের আমন্ত্রন জানাতে গ্রামের ছেলেরা কাহ্নুর গৃহে আসলে বঙ্কীর হাত থেকে কুলাসমেত প্রসাদ পড়ে যায়—যা অমঙ্গলের বার্তা বহন করে। অপরাধ খণ্ডনের প্রত্যাশায় বঙ্কী স্বপরিবারে বুদ্ধ নাটক দেখতে যায়। বুদ্ধদেবের জীবন ও ত্যাগের মন্ত্রে তথা জীবন মহাত্ম্যের কথায় কাহ্নুর চৈতন্যসত্ত্বার কূল ভাঙা নব-জাগরণ শুরু হয়। বঙ্কী, ডোম্বী ও ভুসুকুর সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে মোক্ষলাভের পথে সংসার ত্যাগ করে কাহ্নু। যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি-

> ডোম্বী তুমি ইন্দ্রিয় আস্বাদ দিয়েছো ... এই আস্বাদ না পেলে আমি কোনোদিনই বোধিচিত্তের যোগ্য হয়ে উঠতে পারতাম না...[৪]

বজ্রাচার্য প্রভুর পথ অনুসরণ করে সোমপুর বিহারের সিদ্ধাচার্যদের সাক্ষাৎ নিয়ে নেপালের পথে কাহ্নু যাত্রা করে।

কাহ্নুর নেপাল গমনের সুদীর্ঘ পদযাত্রার মধ্যেই স্বামী বিরহিনী ডোম্বী মৃত সন্তান প্রসব করে। সন্তানহারা বঙ্কী ও ডোম্বীর কষ্ট যন্ত্রনা একই সুরে ধ্বনিত হয়, তাই ডোম্বী বলে ওঠে–'যা এথু চাহমি সো এথু নাহি'- যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। দুই সাধারণ নিয়তি লাঞ্ছিত নারীর জীবন কথা কাব্য হয়ে ওঠে। কাহ্নু নেপাল থেকে তার বাহুবন্ধন পাঠিয়ে দেয়—যার অর্থ সে কোনো দিন সে ফিরবে না। কুক্কুরীর নিয়ে আসা বাহুবন্ধন প্রত্যাখ্যান করে ডোম্বী। পদ্মা পেরিয়ে দস্যু আসে রাতের অন্ধকারে। এই দস্যুরা দুই বছর আগে বঙ্কীর ছেলেকে হত্যা করেছিল তারই সম্মুখে। প্রতিশোধ নিতে ভুসুকু ও ডোম্বী দাঁড়িয়ে থাকে। দস্যুরা বঙ্কীর বস্ত্রহরণ করে। বিবস্ত্র বঙ্কীকে নিয়ে তাদের আদিম মত্ততার আর্ত চিৎকারে ভুসুকুর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। বঙ্কীকে হরণ করে দস্যুরা চলে যায় পদ্মা বেয়ে। ভুসুকুর আর্তনাদ ধ্বনিত হয়-

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী নি অ ঘরিনী চণ্ডালে লেলী।... জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ। [৫]।

ভুসুকু আগুনে ঝাঁপ দেয়। যন্ত্রনার ক্ষতবিক্ষত ভুসুকু মৃত্যুর সময় বলে 'বঙ্কীকে তোরা ঘরে তুলে নিবি'। বঙ্কী ফিরে আসে উন্মাদের মতো। গৃহে স্থান হয় না তার। প্রত্যাখ্যাত বঙ্কীকে নিয়ে ডোম্বী বেরিয়ে পড়ে অজানা পথে। তার প্রতিবাদী সত্তা জাগরিত হয়–যে সমাজ সংসারে বিপন্নের কোনো স্থান নাই, আছে কেবল বিপন্নের অপমান, প্রত্যাখ্যান। সেই সমাজ সংসারের প্রতি ডোম্বীর জাগে অভিমান। তাই সে বঙ্কীর বিপন্নতার সাথে নিজের একাকিত্বের বিপন্নতা আর মৃত সন্তান প্রসবের যন্ত্রনাকে মিশিয়ে নিয়ে অনিশ্চিত পথে বেরিয়ে পড়ে বঙ্কীর সাথে।

ক্ষমাশীল বুদ্ধমন্দির। বুদ্ধমন্দিরে আশ্রয় পায় বঙ্কী ও ডোম্বী। মন্দিরের আলো হাওয়ায় বঙ্কী সুস্থ হয়ে ওঠে, সে পৌঁছে যায় জীবন বোধের পরম নির্বাণে। দস্যু আক্রমনে ভেঙে গেছে নাট্য দল— নাট্যদলে যোগ দেয় বঙ্কী ও ডোম্বী। নব উদ্যমে বুদ্ধ নাটকের আসর জমে ওঠে। বোধিচিত্তের মোক্ষলাভের জন্য কুক্কুরী ইন্দ্রিয় আস্বাদের পথে ডোম্বীকে প্রার্থনা করে। বঙ্কীর আপত্তি সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদী ডোম্বী অজানার পথে যাত্রা করে।

মোহহীন হতে চায় ডোম্বী। দুঃখ-সুখের উর্ধ্বে নির্বাণে পৌঁছাতে চায় তার চিত্ত। আলো আঁধারীর পথ চলে ডোম্বী পৌঁছে যায় নতুন দেশে। প্রবীন ব্রাহ্মনের কথায় ডোম্বী নৌকার পাটনী হয়ে যায়। জীবন নদীর পরিবর্তে জলের নদীতে পাটনী হয়ে যায়। শুরু হয় নতুন জীবন। নৌকা বাইবার সময় দিব্য দৃষ্টিতে ডোম্বী দেখতে পায় দীক্ষাগুরু সরহকে। যার হাত ধরে বৈঠা বাইতে শেখা ডোম্বীর। কিশোর বয়সে সরহের স্নিগ্ধ প্রেমের আকর্ষন সে অনুভব করে। পরক্ষণেই স্মৃতির কল্পনা স্বপ্ন ভেঙে যায়। যুবক মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডোম্বীকে দেখে। যুবক তাকে নিয়ে পদরচনা করে। এই মুগ্ধ পদকর্তার নামও কাহ্নু পাদ। যুবক কাহ্নুতে ডোম্বী দেখতে পায় স্বামী কাহ্নর প্রতিচ্ছায়া। কাজুর শেষ কথা স্মরণে আসে—

> মনে রেখো আত্মার অনুভবে আমি একদিন মৃত্যুহীন হয়ে যাবো। সেদিন আমার আত্মা বিস্তারিত হবে পৃথিবী ব্যাপী... কিছু কিছু মানুষের আত্মাতে মিশে থাকবো আমি.....[৬]

দুই কাহ্নু মিলে গেছে এক বিন্দুতে। কুক্কুরী ডোম্বীর খোঁজে আসে। বোধিচিত্ত প্রার্থী কুক্কুরীকে ডোম্বী প্রত্যাখ্যান করেন। বোধিচিত্ত প্রার্থনার বিরুদ্ধে ডোম্বী প্রতিবাদ জানায়-

> যে পিপাসা একজনকে নিয়ে যায় তৃপ্তিতে-বোধিচিত্তে, আরেক জনকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রনার বেদনায়...সে কেমন পিপাসা কুক্কুরী...[৭]

জীবনের সহজ সুখ তার কাম্য। বোধিচিত্তের পথবিভ্রম ধরা পড়ে ডোম্বীর দৃষ্টিতে। কুক্কুরী ফিরে যায়।

রাজার লোক আসে ডোম্বীর গৃহে। এরমধ্যে প্রাচীন সমাজে নারীদের বিপন্নতার চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। ডোম্বী সংকুচিত হয়। সারা বনে গীত হয় ভীতিকর গান—

আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছড়ই ভুসুকু অহেরী।।[৮]

ভয়ে অতিক্রান্ত রাত্রে ডোম্বীর মনে পড়ে বুদ্ধের কথা, নির্বাণের কথা। রৌদ্রের শুভ্রতায় কাহ্নুপাদ ডোম্বীকে নিয়ে পদ রচনা করে—

এক সো পদমা চউ সঠী পাখুড়ী
তহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী।[৯]

ব্রাহ্মণ কাহ্নু ডোম্বীর প্রেমে মগ্ন, ভুলে যেতে চায় ব্রাহ্মন্য সংস্কার। সমাজের ভীতি উপেক্ষা করে সে গেয়ে ওঠে প্রেমের জয়গান—

ডোম্বী রে তোর শরীর চিরে

হৃদয় নেবো হরণ করে।[১০]

কাহ্নুর পদ শুনে সমাজপতিরা বিব্রত হয়ে ওঠে। তার পিতা মাতার কাছে তারা ছুটে যায়। তারা বলে ও 'ডোম্বী নয় ও নৈরামনি'। ব্রাহ্মনেরা নৈরামনি (ডোম্বী) নিধনের প্রস্তুতি নেয়। একদল লোকের প্রলয় নৃত্য ও আঘাতে ডোম্বী ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভূ-পতিত হয়।

সকালের স্নিগ্ধ আলোয় কাহ্নু ডোম্বীর পাদপদ্মে লুটিয়ে প্রেম নিবেদন করে, বিমূঢ় হয় ডোম্বী। কেননা সেও কাহ্নর মুগ্ধ বাৎসল্যের প্রেমে নিমগ্ন। স্বামী কাহ্নুর ছিল মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। কুক্কুরীর আকাঙ্ক্ষা মোক্ষও ভোগকেন্দ্রিক। আর পদকর্তা কাহ্নুর চোখে সমর্পনের ভাষা। ডোম্বীর আঁচল থেকে রক্ত লোহিত সিঁদুর কাহ্নু রাঙিয়ে দেয় ডোম্বীরই সিঁথি। সমাজ সংসারের বিপক্ষে তাদের প্রেম পায় পূর্ণতা। তারা ভালোবেসে হরিণ-হরিণী বেশে মানুষের অগোচরে বনে ঘুরে বেড়ায়। ভালোবাসা রক্ষার জন্য তারা পালিয়ে বেড়ায়। ভালোবাসা রক্ষার জন্য তারা পালিয়ে বেড়ায় বনে বনান্তরে। সমাজ, ধর্ম, সংস্কারের ঊর্ধ্বে মানব মানবীর প্রেম পূর্ণতা পায়। তাদের প্রেমগাথা চর্যার শরীর থেকে বাংলার মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ে। ডোম্বীর জীবনে প্রেম নানা ভাবে ধরা দেয়, বোধিচিত্তের প্রত্যাশা নয়। কবি প্রেমিক কাহ্নু সমাজ শাসনে লাঞ্ছিত প্রেমিকা ডোম্বীকে গ্রহন করে, ভালোবাসার টানে, নিষ্ঠুর নিষাদ তুচ্ছ করে, হরিণ ও হরিণীর রূপে, তারা সঙ্গী পরস্পরের। এভাবেই সাইমন জাকারিয়া চর্যার পদ থেকে আবহমান বাঙালির, বিশ্বের মানুষের প্রেমগাথার নবনির্মাণ করেছেন।

প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক ও নাটকের সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত *বোধিদ্রুম* নাটকটি। এ নাটকে ব্যবহৃত চরিত্রগুলি কাহ্ন, ডোম্বী, বঙ্কী, ভুসুকু, সরহ, কুক্কুরী। চর্যাপদের পদকর্তাদের নামকে নাটকের প্রধান চরিত্র রূপে নাট্যকার অঙ্কিত করেছেন। বজ্রাচার্য প্রভুর বুদ্ধনাটক চর্যাপদের নব রূপায়ণ। কাহিনিবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে ডোম্বীকে কেন্দ্র করে। ডোম্বী ও কাহ্নুর বিবাহ, বিবাহোত্তর প্রেমময় উপলব্ধি, বুদ্ধ নাটক দর্শন ও মোক্ষ প্রার্থী কাহ্নুর ডোম্বীকে ত্যাগ। ডোম্বীর মৃত সন্তান প্রসব, বঙ্কীকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ, কুক্কুরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অজানায় পাড়ি দেওয়া, প্রেমিক কাহ্নুর কাছে হৃদয় সমর্পন নাটকটিকে পরিনতি দান করেছে। প্রতিবাদী সত্তার উন্মেষে ডোম্বী সে যুগের জাজ্বল্যমান চরিত্র। সমাজ সংসারের বিপক্ষে গিয়ে বঙ্কীকে নিয়ে সংসার ত্যাগে তার দুঃসাহসিকতার পরিচয় গ্রাহী। কাহ্নু ডোম্বীকে আশ্রয় করে বোধিচিত্তের পথে উত্তীর্ণ হয়। কুক্কুরীও ডোম্বীকে আশ্রয় করে বোধিচিত্ত লাভ করতে চায়। ডোম্বী তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ডোম্বীর নারী সত্তার অন্তরালে প্রেমের আকুতি পরিস্ফুট। নৌকা বাইবার সময় সরহের কথা স্মরণ করে কৈশোরের স্মৃতি রোমন্থন করে। অবশেষে প্রেমিক কাহ্নুর নিঃস্বার্থ প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমাজভীতিকে উপেক্ষা করা। সে যুগের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে ডোম্বীকে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার।

অপর দিকে তরুণ পদকর্তা কাহ্নুর প্রেম ও বিদ্রোহ। বিধবা ডোম্বীর প্রতি কাহ্নুর প্রেম ও পরিনতি নাটকের অবয়বে প্রস্ফুটিত। বঙ্কীর প্রতিশোধ স্পৃহা, ভুসুকের সাংসারিক প্রেম, কাহ্নুর বোধিচিত্ত লাভ – এ সবই চর্যার পদকর্তাদের সে যুগের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন। 'বোধিদ্রুম' অর্থাৎ যে বৃক্ষের তলায় বসে শাক্যমুনি বোধি বা নির্বাণ লাভ করে গৌতম বুদ্ধ হয়েছেন। নাট্যকার *বোধিদ্রুম* নাটকে বুদ্ধের অনুষঙ্গে জীবন ও সমাজকে অপরূপ কাব্যময় রূপ দান করেছেন।

'বোধিদ্রুম' নাটকে প্রাচীন বাংলার সামাজিক সংস্কার পরিস্ফুট হয়েছে। তৎকালীন সামাজিক সংস্কার উপলব্ধির জন্য আমাদের দরকার চর্যারযুগে মানস ভ্রমন। বিবাহের পথে পাহাড় দেখে ডোম্বীর একাকিত্ব অনুভব। কাহ্নুকে গৃহ বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য কাহ্নুর মা সূর্য মেলায় গৃহ দেবীর মূর্তি স্থাপন করা। বুদ্ধনাটকের আমন্ত্রন প্রসঙ্গে কুলাসমেত প্রসাদ পড়ে যাওয়া অমঙ্গলের বার্তাবাহী। বঙ্কী-ভুসুকু মনে করে কাহ্নুর মোক্ষলাভের ঘটনা এই সংস্কারের বশবর্তী। নৌকায় শিশু ডোম্বীর জন্য

উপহার সিঁদুর নিয়ে আসা পরবর্তী ঘটনার নিয়ন্ত্রক। এসব ঘটনা তৎকালীন বাঙালীর সংস্কারের স্মারক। দস্যু আক্রমনে সেকাল বাংলার সমাজের চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে নাটকের অবয়বে।

বোধিদ্রুম নাটকে সংলাপের পরিবর্তে কথনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে নাটকের কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। চর্যাপদ ও তার পদকর্তা, চর্যাপদ সমসাময়িক সময়, সমাজ ও চরিত্রেরা নাটকের প্রাচীন বাংলার আবহ সৃষ্টি করেছে। চর্যার শব্দ ও বাক্য ব্যবহার নাটকের স্বাতন্ত্র্য সূচিত করেছে। নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া নতুন আঙ্গিকে *বোধিদ্রুম* নাটকে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবন কে কাহিনিবৃত্তে গ্রথিত করেছেন। চর্যার বিনির্মাণে ও বাংলা সাহিত্যের পটভূমি সম্প্রসারণে *বোধিদ্রুম* নাটক আধুনিকতার এক অনন্য মাইলস্টোন।

তথ্যসূত্র

১. জাকারিয়া, সাইমন, *বোধিদ্রুম,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ *২০১৪, প্রশ্চদ অংশ।*
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।